দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৫।৪।৭৮ ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম... ... ...

২৫৬

নিঝুম দ্বীপের কাহিনী

সাগরের অথৈ পানি। তারই মাঝে ঠায় দাঁড়িয়ে প্রশস্ত এক ভূখন্ড। নাম চর ওসমান। এ নাম জেলেদের দেয়া। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন নিঝুম দ্বীপ।

নিঝুম দ্বীপ। নামটি কাব্যিক। পরিবেশের সাথে এ নামের সম্পর্ক নিবিড়। নিঝুম দ্বীপের চারিদিক ঘিরে সাগর জল। ঢেউ-এর অশান্ত গর্জন। দিগন্ত প্রসারী নীল আকাশ। জনবসতি নেই বললেই চলে। লোকালয় বিবর্জিত এক নিস্তব্ধ পরিবেশ। এমনি পরিবেশ মানুষকে ভাবুক করে তোলে। মনে দোলা লাগে কাব্যের। এখানে এসে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের বস্তুবাদী মনেও হয়ত কাব্যের দোলা লেগে ছিল। তাই তাঁরা চর ওসমানের কাব্যিক নাম দিয়েছেন নিঝুম দ্বীপ।

নিঝুম দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা এক নতুন চর। পশ্চিমে বরিশাল জেলার মনপুরা ও জাঙ্গালিয়া। উত্তর-পশ্চিমে হাতিয়া। দূরত্ব ষাট মাইল। হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপের মধ্যে রয়েছে শুকচর, মনপাশা ও চরমুক্তারিয়া। এই চরগুলো সবই আবাদী। নিঝুম দ্বীপের সবচেয়ে কাছাকাছি চরমুক্তারিয়া। জোয়ারের সময় এ দুটি চরের মধ্যে জলপথের ব্যবধান দশ মাইল। ভাটার সময় এই ব্যবধান সংকুচিত হয়ে মাত্র দু মাইলে দাঁড়ায়। অচিরেই নিঝুম দ্বীপ ও চরমুক্তারিয়া সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

নিঝুম দ্বীপের বয়স বাহাত্তর বছর। কিন্তু বয়স বাহাত্তর হলেও এ দ্বীপে স্থায়ী কোন বসতি গড়ে উঠতে পারেনি এখনও। সে এক রহস্য। আর সে রহস্য নাটকের নেপথ্যনায়ক ভূমিলিপ্সু জোতদার গোষ্ঠী—ভাটিঅঞ্চলের কৃষকদের ত্রাস। মধ্যযুগীয় দস্যুদের প্রেতাত্মা বললেও হয়তো ভুল হয় না। জোতদারদের সহযোগী উপকূলীয় জেলাগুলোর কিছু সংখ্যক আমলা। এই দুই শক্তি গাঁটছড়া বেঁধেছে উপকূলীয় এলাকার কৃষকদের বিরুদ্ধে। বলা যায়, তারই ফলে নিঝুম দ্বীপ অনাবাদী। এতে সরকার বঞ্চিত হচ্ছেন রাজস্ব থেকে। আর খাদ্যে ঘাটতি আমাদের এদেশ বঞ্চিত হচ্ছে বছরে অন্যূন এক কোটি টাকার ধান ও সমপরিমাণ মূল্যের অন্যান্য অর্থকরী ফসল থেকে।

আজকের নিঝুম দ্বীপে জনবসতি না থাকলেও সাবেকচর ওসমান কিন্তু অনাবাদী ছিল না। ১৯৫৯-৬০ সালে চর ওসমান জরীপ করেন খাস মহলের জরীপ বিভাগের কর্মচারীরা। সে জরীপ কার্য তদারক করেছিলেন নলচিরার তৎকালীন সার্কেল অফিসার। তারা চরওসমানকে পাঁচটি শীটে ভাগ করে মোট ৫২১৩.৭০ একর জমি রেকর্ড করেন। সে বছরই চরওসমানের ১৪৫৩.৩৪ একর জমি কৃষকদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য অনুমোদন করা হয়। তার মধ্যে প্রচলিত হারে সালামী নিয়ে ৬২৫.১৬ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। বন্দোবস্ত দেয়া এসব জমির খতিয়ান ও কিত্তাও খোলা হয়েছিল। বন্দোবস্ত দেয়ার জন্যে অনুমোদিত বাকী ৮২৮.১৮ একর জমির বন্দোবস্ত এক শ্রেণীর আমলা ও জোতদারদের ষড়যন্ত্রে ভেস্তে যায়।

জমি বন্দোবস্ত নেয়ার পর পরই কৃষকরা চাষাবাদ শুরু করেন চর ওসমানে। এখানকার জমি আশাতীত ভাবে উর্বর। ধান ছাড়াও চর ওসমানে ডাল, মরিচ তরিতরকারী, তরমুজ ইত্যাদি অর্থকরী ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। সে কারণে যোগাযোগের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখানে দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ১৯৭০ সালে উপকূলীয় এলাকায় নেমে আসে ইতিহাসের সব চেয়ে মর্মান্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় এলাকার লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ হয় বিনষ্ট। আর কৃষকের জোতজমা গরু মহিষ ভেড়া ছাগল ভাসিয়ে নেয় বানে। সে সর্বনাশা গর্কিতে চরওসমানের এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ১৫ জন জীবিত ছিলেন। বাকী সবাইকে প্রাণ দিতে হয়েছে সামুদ্রিক বানে।

সত্তরের জলোচ্ছ্বাসে চরওসমান বিরান হয়েছে সত্যি। কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে হাতিয়ার জোতদারদের। চরওসমানে যাতে আবার বসতি গড়ে উঠতে না পারে সে চেষ্টা করতে লাগলো তারা। একশ্রেণীর আমলা আর জোতদারদের ভূমিকাও ছিল এর পেছনে। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি নয়, কৃষকদের ঠকানোর উদ্দেশ্যেই ছিল এর মূলে। কৃষকদের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন হাতিয়ার প্রভাবশালী একজন জোতদার। তিনি রাজনীতি করেন, আর রাজনৈতিক প্রভাবও তাঁর যথেষ্ট।

চরওসমানকে বনবিভাগের হাতে তুলে দেয়ার পেছনে কোনো শুভ উদ্দেশ্য থাকলে ক্ষতির কিছু ছিল না, কিন্তু জোতদারদের আসল উদ্দেশ্য ছিল এভাবে কৃষকদের জমি থেকে বঞ্চিত করা। বন বিভাগের আওতায় রেখে নানা কারসাজিতে চরওসমানের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করাও জোতদারদের উদ্দেশ্য ছিল, তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। উপকূলীয় এলাকায় অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী পরিবহণের চোরাই মাল, চর এলাকার চোরাই গবাদিপশুর একটি আখড়া চরওসমানে গড়ে তোলাই ছিল জোতদারদের উদ্দেশ্য। সর্বোপরি সময়-সুযোগ মত চরওসমানকে বনবিভাগের আওতামুক্ত করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়াও ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

কার্যতঃ কি হচ্ছে তাও ভেবে দেখার মতো। সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ের পর চরওসমানের সাবেক কৃষকরা সেখানে চাষাবাদের জন্যে গেলে বন বিভাগের কর্মচারীরা নাকি তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। বনবিভাগ তখনও চরওসমানের কোন জমি ভূমি প্রশাসন বিভাগ থেকে নেয়নি। ১৯৭৫ সালে সরকার বনবিভাগকে ১৮৬৯.৩৩ একর জমি বরাদ্দ করেন। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে বন বিভাগ চরওসমানের সম্পূর্ণ জমির দখল নিলেও আজ পর্যন্ত তারা চরওসমানে কোন বন সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে কাগজে কলমে ১৯৭৬ সাল থেকে গাছ লাগানোর পরিকল্পনার কাজ শুরুর কথা আছে। অথচ বন বিভাগ চরওসমানের জমি নিয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে। চরওসমানে গাছ গাছড়া যা আছে তার সবই প্রকৃতির দান। বন সৃষ্টি করতে না পারলেও বনবিভাগ সেখানে বাংলো বানিয়েছে। দেখা গেছে উপকূলীয় এলাকার জোতদার আর তাদের সহযোগী আমলারা হরহামেশা সেখানে যান অবকাশ যাপন করতে। তাঁদের আমোদ প্রমোদের উত্তম জায়গা হলো—এই নিঝুম দ্বীপ।

উপকূলীয় অঞ্চলে বনবিভাগের অন্যতম কাজ হলো নদী বা সমুদ্র গর্ভ থেকে সদ্য জেগে উঠা চরকে আবাদযোগ্য ও স্থায়ী করার জন্য বন সৃষ্টি করা। নতুন চরে মাটি নরম থাকে। বিমান থেকে বীজ ছড়িয়ে সেখানে গাছ জন্মানো হয়। গাছের শিকর মাটিতে প্রবেশ করলে মাটি শক্ত হয় এবং চরের স্থায়িত্ব বাড়ে। এভাবে কয়েক বছর বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকার পর গাছগাছড়া কেটে শুরু করা হয় চাষাবাদ।

কিন্তু নিঝুম দ্বীপে এ ধরনের বন সৃষ্টির কোন প্রয়োজন আছে কিনা, তা-ও একটি প্রশ্ন। কেননা এই চারটি বহু দিনের পুরনো। এখানে চাষাবাদ হয়ে আসছে গত বিশ বছর ধরে। বন সৃষ্টির আদৌ কোন প্রয়োজন নিঝুম দ্বীপে থাকলে তা করা যেতে পারে দ্বীপের চতুর্দিক ঘিরে সীমিত এলাকা জুড়ে। বাদবাকী সম্পূর্ণ এলাকা চাষাবাদের জন্যে ছেড়ে দেয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি। এই প্রত্যাশা শুধু হাতিয়ার কৃষকদের নয়। এই অভিমত বলা চলে উপকূলীয় চর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সকল মহলের।

নিঝুম দ্বীপে চাষাবাদের দাবী জানিয়েছে হাতিয়া কৃষি খামার ও বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। এই সমিতির পক্ষ থেকে চরওসমানের জমি বন্দোবস্ত নেয়ার আবেদন করা হয়েছে ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়ে। ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয় হাতিয়ার ছিন্নমূল কৃষকদের সংগঠন এই সমিতিকে জমি বরাদ্দের জন্যে সহানুভূতিশীল। কিন্তু বাধসাধছে নাকি জেলা প্রশাসনের কোন কোন আমলা। অভিযোগ যে তারা জোতদারদের সাথে আঁতাত করে এই শুভ প্রচেষ্টাকে নানাভাবে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে।

হাতিয়া কৃষি খামার ও বহুমুখী সমবায় সমিতির সম্পাদকের অভিমত হলো: গত দু বছরে নদীর ভাঙ্গনে হাতিয়ার কয়েক হাজার পরিবার ভিটেমাটি হারা। এরা আশ্রয় নিয়েছে ওয়াপদার বেড়ি বাঁধে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে এরা দুঃসহ জীবন যাপন করছে। নিঝুম দ্বীপে সমিতির মাধ্যমে এদের বসবাস করার অনুমতি দিলে সমস্যার সমাধান হবে। সমিতির প্রয়োজন এজন্যে যে নদী সিকস্তী কৃষকদের আড়াই একর জমি দিলে তারা রাখতে পারে না। কৃষি উপকরণ জোগাড় করতে না পেরে এবং আর্থিক অনটনে তারা সে জমি বিক্রি করে দেয় জোতদারের কাছে। ফলে ভূমিহীন কৃষক ভূমিহীনই থেকে যায় চিরকাল। কাজেই সমবায়ের মাধ্যমেই ছিন্নমূল কৃষকদের পুনর্বাসন করা সম্ভব। এর বিকল্প কোন ব্যবস্থা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নেই।

হাতিয়া কৃষি খামার ও বহুমুখী সমবায় সমিতির কর্মকর্তাদের আরও অভিমত হলো, বরিশাল থেকে শুরু করে চকরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় বিগত দু দশকে চুয়াল্লিশটি নতুন চর উঠেছে। এগুলোর সবই খাস জমি অথচ বয়ালীর (সাবেক মালিকানা) দাবী নিয়ে জোতদাররা এসব খাস জমির অধিকাংশই দখল করে রেখেছে। তাদের কবল থেকে এসব জমি উদ্ধার করতে পারলে হাতিয়া ও উপকূলের অন্যান্য নদী সিকস্তী সকল ছিন্নমূলের পুনর্বাসন সম্ভব। তার জন্যে প্রয়োজন সরকারী উদ্যোগ ও প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা। আমলারা কৃষকদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল না হলে জোতদারদের কাছ থেকে সরকারী খাস জমি উদ্ধার করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

আহমদ নজীর